বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৪১ বার্ষিক সংখ্যা ১৪৩০

বিগত কয়েক দশকে গ্রামীণ উন্নয়নের গতিধারা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

কাজী সাহাবউদ্দিন*

১। ভূমিকা

একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার দরিদ্র দেশগুলি অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে ক্ষুধা, অপুষ্টি এবং দারিদ্র্যের উপশম হয় এবং গ্রামীণ এলাকায় বসবাসরত জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নতি ঘটে। এই দেশগুলির গ্রামীণ এলাকায় বসবাসরত ৭৫ কোটি জনসংখ্যার প্রায় ৮৫ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে এই দরিদ্র জনগণের চার ভাগের তিন ভাগই বসবাস করছে। এদের মাঝে দুই-তৃতীয়াংশ জনগণ বাস করছে কেবল চারটি দেশে যেমন ভারত, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান।

এই সকল দেশের দরিদ্র জনগণ যারা গ্রামীণ এলাকায় বাস করছে, তারা প্রধানত তাদের জীবন ধারণের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল, যদিও সম্পদের যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তারা প্রজাস্বত্বভোগী অথবা বর্গাচাষি যাদের আয় অত্যন্ত সীমিত এবং এক ধরনের অনিশ্চয়তার শিকার। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ছিল ভূমিহীন অথবা কার্যত: ভূমিহীন এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য তাদের মৌসুমীভিত্তিক অকৃষি কার্যে নিয়োজিত হতে হয়। অতীতে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী জনগণের জন্য কোনো সুফল বয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে শহর এবং গ্রামের উন্নয়নে বহুলাংশে বৈষম্য ও ভারসাম্যহীনতা দৃশ্যমান।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিবেশে গ্রামের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রামগুলি যে কেবল প্রাথমিক প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে পরিগণিত তাই নয়, দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বহুলাংশে কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট খাত সমূহের ওপর নির্ভরশীল কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সংযোগের মাধ্যমে (পশ্চাৎমুখী এবং অগ্রবর্তী উভয় সংযোগ)। তবুও শতাব্দীব্যাপী এই গ্রাম অবহেলার শিকার এবং রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ক্ষমতার বলয় থেকে বিচ্ছিন্ন রয়ে গেছে। উপরন্তু, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও উপেক্ষিত। প্রকৃতপক্ষে এই গ্রামসমূহ শহরে অবস্থানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনের "উপনিবেশে" পরিণত হয়েছে (Khan & Zafarullah, 1981)।

সাম্প্রতিককালে অবশ্য এই দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতি প্রণয়ন এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে গ্রামীণ উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে যে নতুন কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে যার ভিত্তি "top-down" পন্থার পরিবর্তে "bottom-up" পন্থা অনুসরণ করা, যেখানে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। বাংলাদেশে

* সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)।

সরকার এমন কর্মসূচি প্রণয়ন করছে যার মূল উদ্দেশ্য গ্রামগুলিকে আরও স্বশাসিত ও স্বনির্ভর করে তোলা। কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থা এবং গ্রামীণ এলাকায় ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন- এগুলোকে কর্মসূচির প্রধান উপাদান হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে; স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূহকে শক্তিশালী করা হয়েছে এবং এদের দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য নতুন গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে যাতে গ্রামের জনগণকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অধিকতর সম্পৃক্ত করা যায়।

সরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে (স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখা যায় যাতে গ্রামীণ এলাকায় দরিদ্র জনগণ স্বনির্ভর হয়ে উঠতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (IRDP) যা আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত কুমিল্লা মডেলের অনুসারী। দেশব্যাপী সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে এই কর্মসূচি গ্রামীণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করতে সচেষ্ট ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই কর্মসূচি কুমিল্লা মডেলের ন্যায় সার্থকতা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। তাই স্বাধীনতা পরবর্তীকালে নতুন কর্মসূচি প্রবর্তন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে দেশের গ্রামীণ এলাকায় অর্থবহ পরিবর্তনের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। এর ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় এবং সামাজিক পরিবর্তনে এক নতুন মাত্রা যোগ হয় (Khan & Zafarullah, 1981)।

২। কৃষি, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচন

২.১। কৃষি, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচন

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলাদেশে কৃষিখাতের অগ্রগতি ছিল মোটামুটি সন্তোষজনক। ১৯৯০/৯১–১৯৯৯/০০ দশকের কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধির হারের (৩.৫ শতাংশ) তুলনায় ২০০০/০১-২০০৯/১০ দশকে প্রবৃদ্ধির হার (৩.৯ শতাংশ) কিছুটা বেশি ছিল, যদিও সাম্প্রতিককালে প্রবৃদ্ধির এই হার (৩.৬) কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধির উর্ধ্বগতি দেশে অর্থনীতির সার্বিক উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রেখেছে। নব্বইয়ের দশকের তুলনায় (৫.৩ শতাংশ) একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির হার (৫.৯) বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিককালে জাতীয় আয়ের এই প্রবৃদ্ধির হার (৬.৪ শতাংশ) আরও ত্বরান্বিত হয়েছে (সারণি ১)।

সারণি ১: কৃষিখাত ও জাতীয় আয়ের দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি: ১৯৭৩/৭৪–২০১৭/১৮

খাত/উপখাত	১৯৭৩/৭৪-১৯৮৯/৯০	১৯৯০/৯১-১৯৯৯/২০০০	২০০০/০১-২০০৯/১০	২০১০/১১-২০১৭/১৮	১৯৭৩/৭৪-২০১৭/১৮
কৃষি	২.৬	৩.৫	৩.৯	৩.৬	৩.৮
শস্য	১.৭	২.৫	৩.৭	১.৯	৩.৫
বনসম্পদ	৩.৮	৩.৮	৪.৩	৬.৩	৪.৭
প্রাণীসম্পদ	৫.২	৭.৩	৫.১	৩.৩	৪.১
মৎস্য	২.৩	৭.৮	৩.১	৭.৪	৪.৭
জাতীয় আয়	৪.১	৫.৩	৫.৯	৬.৪	৪.৯

উৎস: Hossain, M. I. et al. (2012) কর্তৃক প্রণীত এবং এই প্রবন্ধের লেখক কর্তৃক হালনাগাদকৃত।

কৃষিখাতের উপর্যুক্ত প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছিল মৎস্য এবং প্রাণীসম্পদ উপখাতের দ্রুত প্রবৃদ্ধির ফলে। বিগত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে শস্য উপখাতের তুলনায় মৎস্য এবং প্রাণীসম্পদ উপখাতের প্রবৃদ্ধির হার ছিল বেশি। নব্বইয়ের দশকে মৎস্য উপখাতের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.৮ শতাংশ, যদিও পরবর্তী দশকে এই হার যথেষ্ট হ্রাস পায়। কিন্তু সাম্প্রতিককালে প্রবৃদ্ধির হার (৭.৪ শতাংশ) উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাণীসম্পদ উপখাতের প্রবৃদ্ধির হার (৭.৩ শতাংশ) নব্বইয়ের দশকে ছিল বেশ সন্তোষজনক কিন্তু পরবর্তী দশকে (৫.১ শতাংশ) এবং সাম্প্রতিককালে প্রবৃদ্ধির এই হার (৩.৩ শতাংশ) যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। নব্বইয়ের এবং পরবর্তী দশকে বনসম্পদ উপখাতের প্রবৃদ্ধির হার তেমন সন্তোষজনক ছিল না (প্রায় ৪.০ শতাংশ), কিন্তু সাম্প্রতিককালে এই প্রবৃদ্ধির হার (৬.৩ শতাংশ) যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং পূর্ববর্তী সময়ের, বিশেষ করে স্বাধীনতা পরবর্তী কালের তুলনায় সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে কৃষিখাতে বহুমুখীকরণ ঘটেছে। ১৯৭৩/৭৪ সালে মোট কৃষির আয়ে প্রাণীসম্পদ, মৎস্য এবং বনসম্পদ উপখাত সমূহের অংশ ছিল মাত্র ২০ শতাংশ; ২০১৯/২০ সালে এই অংশ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৪৯ শতাংশে দাঁড়ায়।

ধান এখনও শস্য উপখাতের প্রধান শস্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। যদিও ধান চাষের জমির পরিমাণ ৯.২৮ মিলিয়ন হেক্টর থেকে ১০.৫০ মিলিয়ন হেক্টর পর্যন্ত সামান্যই বৃদ্ধি পেয়েছে, চালের উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে – ১৯৭১-৭২ সালের ৯.৭৭ মিলিয়ন টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯১-৯২ সালে ১৮.২৬ মিলিয়ন টন, ২০০৯-১০ সালে ৩২.৩৬ মিলিয়ন টন এবং ২০১৭-১৮ সালে আরও বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬.২৮ মিলিয়ন টনে দাঁড়িয়েছে (সারণি ২)। অর্থাৎ চালের উৎপাদন বছরে ২.৮৯ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় (২.১১ শতাংশ) অনেক বেশি। ফলে মাথাপিছু চালের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে – ১৯৭১-৭২ সালের ১৫৫.৫৬ কেজি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯১-৯২ সালে ১৬৩.৮৩ কেজি, ২০০৯-১০ সালে ২২৭.৩৭ কেজি এবং ২০১৭-১৮ সালে আরও বৃদ্ধি পেয়ে ২২০.২৮ কেজিতে দাঁড়িয়েছে। উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি ছিল উচ্চ ফলনশীল (উফশী) ধানের প্রচলন এবং প্রসার যা প্রধানত সম্ভব হয়েছে অগভীর নলকূপের মাধ্যমে চাষকৃত জমিতে সেচ প্রদান এবং অধিক পরিমাণে রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে। দেশের মোট চাষকৃত জমির প্রায় ৯৫ শতাংশ বর্তমানে সেচের আওতায় এবং প্রায় ৯০ শতাংশ ধানী জমিতে এখন উফশী ধান চাষ করা হচ্ছে। ফলে ধানের ফলন ১৯৭১-৭২ সালের হেক্টর প্রতি ১.০৫ টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯১-৯২ সালে ১.৭৮ টন, ২০০৯-১০ সালে ২.৮৭ টন এবং ২০১৭-১৮ সালে ৩.৪৫ টনে বৃদ্ধি পায়।

সারণি ২: আধুনিক প্রযুক্তির প্রসার এবং চাল উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির উপর এর প্রভাব

নির্দেশক	১৯৭১-৭২	১৯৮১-৮২	১৯৯১-৯২	২০০১-০২	২০০৯-১০	২০১৭-১৮
ধান চাষকৃত জমির পরিমাণ (মিলিয়ন হেক্টর)	৯.২৮	১০.৪৬	১০.২৪	১০.৬৬	১১.২৭	১০.৫০
উফশী ধানের এলাকা (%)	৬.৭৩	২২.২২	৪৭.৪১	৬৪.৫৭	৭৯.৭৭	৮৯.৬৭
চালের ফলন (টন/হেক্টর)	১.০৫	১.৩০	১.৭৮	২.২৮	২.৮৭	৩.৪৫
চাল উৎপাদনের পরিমাণ (মিলিয়ন টন)	৯.৭৭	১৩.৬৩	১৮.২৬	২৪.৩০	৩২.৩৬	৩৬.২৮
জনসংখ্যার পরিমাণ (মিলিয়ন)	৬২.৮০	৮৭.১২	১১১.৪৬	১২৪.৩৬	১৪২.৩২	১৬৪.৭২
মাথাপ্রতি চালের উৎপাদন (কেজি)	১৫৫.৫৭	১৫৬.৪৫	১৬৩.৮৩	১৯৫.৪০	২২৭.৩৭	২২০.২৮

উৎস: Hossain, M. I. et al. (2012) কর্তৃক প্রণীত, যা এই প্রবন্ধের লেখক কর্তৃক হালনাগাদ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে অধিকাংশ শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেই তুলনামূলক সুবিধা রয়েছে (Shahabuddin, 2000)। কিন্তু বাজারজাতকরণের বিভিন্ন সমস্যার জন্য ফসল কাটার অব্যবহিত পরেই এর মূল্য যথেষ্ট হ্রাস পায়, যার ফলে পরবর্তীতে উৎপাদনের প্রণোদনার ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলে অবশ্য "পশ্চাৎমুখী এবং অগ্রবর্তী সংযোগের" মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার অকৃষি খাতের যথেষ্ট সম্প্রসারণ ঘটেছে। অর্থাৎ কৃষির প্রবৃদ্ধির ফলে গ্রামীণ এলাকায় অকৃষি খাতে নিম্নোক্ত কারণে আয় এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করেছে। প্রথমত, অকৃষি খাতে সেচযন্ত্রের এবং রাসায়নিক সারের বর্ধিত চাহিদার প্রভাব, দ্বিতীয়ত, অধিকতর শস্য উৎপাদন শস্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুদামজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণের জন্য বর্ধিত চাহিদার সৃষ্টি এবং তৃতীয়ত, কৃষকেরা তাদের বর্ধিত আয়ের এক বিরাট অংশ অকৃষিখাতের বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য এবং সেবা ক্রয়ে ব্যয় করে (Hossain, M. I. et al., 2012)।

Ahmed and Hossain (1990) কর্তৃক প্রণীত এক সমীক্ষায় দেখা যায়, গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্যের পরিমাণ ১৯৬৩-৬৪ থেকে ১৯৭৩-৭৪ সময়কালে ৭৫ শতাংশে স্থবির হয়ে পড়েছিল; কিন্তু ১৯৭৪-৭৫ সালের দুর্ভিক্ষের কারণে এটা বৃদ্ধি পেয়ে ৮৪ শতাংশে উন্নীত হয়। বিবিএস এর তথ্য অনুযায়ী, গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্যের পরিমাণ ১৯৮১-৮২ সালের ৭৪ শতাংশ থেকে ১৯৮৮-৮৯ সালে ৪৮ শতাংশে হ্রাস পায়। আশির দশকে দারিদ্র্যের অবস্থার, সরকারি তথ্য অনুযায়ী, এই অভূতপূর্ব উন্নতি যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি করে এবং আংশিকভাবে হলেও এই অবস্থাকে ১৯৮৩-৮৪ সালে সরকারি তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতির পরিবর্তনের ওপর আরোপ করা হয়। ২০০০-২০১৬ সময়কালে জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য ৪৮.৯ শতাংশ থেকে ২৪.৭ শতাংশে হ্রাস পায় কিন্তু গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্য শহরের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। বিগত কয়েক দশকে দারিদ্র্যের পরিমাণ বছরে ১.৫৭ শতাংশ হারে (percentage points) হ্রাস পেয়েছে কিন্তু গ্রামীণ এলাকায় ৩৫.২ শতাংশ দারিদ্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে এটাকে হতাশাজনক হিসেবে গণ্য করা হয়। নব্বই এবং এর পরবর্তী দশকে তুলনামূলকভাবে অর্থনৈতিক দ্রুত প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও দারিদ্র্যের পরিমাণ হ্রাসের এই শ্লথ গতি দেশে আয়ের বণ্টনের বৈষম্যের প্রতি দিকনির্দেশ করে (Sen, 2003)।

দারিদ্র্য একটি বহুমাত্রিক বিষয়। মানব উন্নয়নের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিগত কয়েক দশকে সীমিত আকারে হলেও সাফল্য লাভ করেছে। ১৯৯০-২০১৭ সময়কালে বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার হাজার প্রতি ৬০ থেকে প্রায় ১১২ তে উন্নীত হয়েছে এবং শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৯৯ থেকে ২৯-এ হ্রাস পেয়েছে। সুপেয় খাবার পানির ক্ষেত্রে জনগণের অধিগম্যতা, ১৯৯০-২০১৫ সময়কালে, মোট জনসংখ্যার ৭৮ শতাংশ থেকে প্রায় ৮৭ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একই সময়কালে উন্নত পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা ২৬ শতাংশ থেকে প্রায় ৬১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে বেশি সাফল্য অর্জিত হয়েছে। মোট প্রজনন হার অর্থাৎ প্রতি মহিলার ক্ষেত্রে সন্তান জন্মের সংখ্যা ১৯৯০ সালের ৬.১ থেকে ২০১০ সালে ২.২-এ হ্রাস পেয়েছে, যদিও পরবর্তীকালে এই ক্ষেত্রে স্থবিরতা লক্ষ করা যায়। সরকারি আদমশুমারি থেকে দেখা যায়, দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আশির দশকের ২.২ শতাংশের তুলনায় পরবর্তী দুই দশকে ১.৩ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে (সারণি ৩)।

সারণি ৩: মানব উন্নয়ন সূচকের অগ্রগতি

সূচক/নির্দেশক	১৯৯০	২০১০	২০১৭
শিশু মৃত্যুর হার (হাজারপ্রতি)	৯৯	৩৮	২৯
পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার (হাজারপ্রতি)	১৪৩	৪৮	৩২
মাতৃমৃত্যুর হার (হাজারপ্রতি)	৪.৭৮	২৬০	১.৮*
প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতার হার (হাজারপ্রতি)	৩৭	৫৬	৭৩
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার (হাজারপ্রতি)	৬০	১০৮.৮	১১১.৭
মহিলাদের উর্বরতার হার	৬.১	২.২	২.২
জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার	২.২	১.৩	১.০
সুপেয় পানির অধিগম্যতা (মোট জনসংখ্যার হার)	৭৮	৯৮.১	৮৬.৯*
জন্মকালে প্রত্যাশিত আয়ু (বছর)	৫৯.১	৬৯.০	৭২.৭
মোট জনসংখ্যার কতভাগ উন্নত পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা সুযোগপ্রাপ্ত (%)	২৬.০	৫৩.০	৬০.৬*

নোট: * ২০১৫ সালের হিসাব/সংখ্যা নির্দেশ করে।

উৎস: Hossain, M. I. et al. (2012) কর্তৃক প্রণীত, যা এই প্রবন্ধের লেখক হালনাগাদ করেছেন।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে বাংলাদেশে বহির্মুখ অভিঘাত থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আগের তুলনায় অনেক কমেছে। খাদ্য উৎপাদনের মৌসুমি প্রকৃতি পরিবর্তনের ফলে জনগণের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করা সহজতর হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রায়শ খরা কবলিত আউশ ধানের জমির পরিমাণ ১৯৭১-৭২ সালে ৩০ লাখ হেক্টরের তুলনায় ২০১৭-১৮ সালে প্রায় ১১ লাখ হেক্টরে হ্রাস পেয়েছে; এই জমিতে বর্তমানে উচ্চ ফলনশীল অথচ তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল বোরো ধান অথবা অন্যান্য লাভজনক শস্য যেমন শাকসবজি এবং ফলের চাষ করা হচ্ছে। অধিক সংখ্যায় অগভীর নলকূপ ব্যবহারের ফলে যা সম্পূরক সেচ প্রদানে সাহায্য করে, খরার কারণে আমন ধানের ফলনের ক্ষতির যে আশঙ্কা ছিল, তাও বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। গভীর পানিতে উৎপাদিত আমন ধানের চাষকৃত এলাকা ১৯ শতাংশ থেকে মাত্র ৩ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে; ফলে বন্যার কারণে ধান উৎপাদনের ক্ষতির পরিমাণও কমে গেছে। বর্ষা মৌসুমে গভীরভাবে প্লাবিত জমি এখন কৃষকেরা অনাবাদি রেখে দেয় যাতে পরবর্তী শুষ্ক মৌসুমে সেখানে সেচের সাহায্যে বোরো ধান চাষ করা যায় (সারণি ৪)। বিগত চার দশকেরও অধিক সময়ে বোরো চাষকৃত জমির পরিমাণ ৯ লাখ হেক্টর থেকে ৪২ লাখ হেক্টরে উন্নীত হয়েছে। ফলে বর্তমানে মে-জুন মাসে দেশের মোট খাদ্যশস্যের (গমসহ) পরিমাণের ৫৫ শতাংশ উৎপাদিত হয়। এর ফলে বন্যা অথবা খরার ক্ষতিগ্রস্তজনিত কারণে ধান উৎপাদনে যে ঘাটতির সৃষ্টি হয় তা কয়েক মাসের মধ্যে মেটানো সম্ভব হয়। উপরন্তু, বিভিন্ন মৌসুমে ধান উৎপাদনের ফলে, ভূমিহীন কৃষকেরা যে মৌসুমভিত্তিক কর্মসংস্থান এবং আয়ের ক্ষতির সম্মুখীন হতো, সেটা এখন পূর্বের তুলনায় অনেকটাই কমে গেছে (Hossain, M. I. et al., 2012)।

সারণি ৪: বাংলাদেশে ধান চাষের বিন্যাসের পরিবর্তন: ১৯৭১-৭২ থেকে ২০১৭-১৮

	১৯৭১-৭২		২০০৯-১০		২০১৭-১৮	
	জমির আয়তন (মিলিয়ন হেক্টর)	মোট জমির অংশ (%)	জমির আয়তন (মিলিয়ন হেক্টর)	মোট জমির অংশ (%)	জমির আয়তন (মিলিয়ন হেক্টর)	মোট জমির অংশ (%)
আউশ	৩.০০	৩২.২২	০.৯৮	৮.৬৭	১.০৮	৯.৩০
গভীর পানিতে চাষকৃত আমন	১.৭৭	১৯.০১	০.৪৭	৪.১৯	০.৩৭	৩.১৯
রোপা আমন	৩.৬৪	৩৯.১০	৫.১৯	৪৫.৬৯	৫.৩১	৪৫.৫৭
বোরো	০.৯০	৯.৬৭	৪.৭১	৪১.৪৬	৪.৮৯	৪২.০৮
মোট	**৯.৩১**	**১০০.০০**	**১১.৩৫**	**১০০.০০**	**১১.৬২**	**১০০.০০**

উৎস: Hossain, M. I. et al., (2012) কর্তৃক প্রণীত, যা এই প্রবন্ধের লেখক হালনাগাদ করেছেন।

২.২। দারিদ্র্য বিমোচনে কৃষির ভূমিকা

কৃষি কার্যক্রম প্রধানত জমিকে ভিত্তি করে হয়ে থাকে; ফলে জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কৃষি উন্নয়নের প্রধান পূর্বশর্ত। কিন্তু এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি খানার কৃষকেরা ভূমিহীন অর্থাৎ তাদের কোনো কৃষি জমি নেই। সুতরাং কৃষির উন্নয়ন এই সকল ভূমিহীন কৃষকদের (যাদের অধিকাংশই হতদরিদ্র) জীবিকা উন্নয়নে কীভাবে সাহায্য করবে?

তর্কের খাতিরে অবশ্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মধ্যম এবং বৃহৎ আয়তনের জমির মালিক তাদের কৃষিজমিতে কাজের জন্য ভূমিহীন চাষীদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের সুযোগ সৃষ্টি করে। কিন্তু এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে মধ্যম ও বৃহৎ আয়তনের জমির মালিকানা স্বল্পসংখ্যক লোকের মাঝে সীমাবদ্ধ এবং তাদের সংখ্যা নগণ্য। সুতরাং তাদের পক্ষে ভূমিহীন এবং প্রান্তিক চাষীদের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান করা সম্ভব নয়। উপরন্তু, প্রথমে যখন উফশী ধানের প্রচলন করা হয়েছিল, কৃষিকার্যে শ্রমিকের চাহিদা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে জমি চাষ, সেচ কাজ এবং ধান কাটার প্রক্রিয়া যান্ত্রিকীকরণের ফলে এই চাহিদা ক্রমশ হ্রাস পায়। বস্তুত কৃষির শ্রম বাজারে যদি পরিপূর্ণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলেও বিরাজমান মজুরির হার দারিদ্র্য নিরসনের জন্য যে আয়ের প্রয়োজন তার সংকুলান করা সম্ভব হবে না।

প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রতিককালে অকৃষি খাতের সম্প্রসারণ ভূমিহীন কৃষকদের আয় বৃদ্ধির সুযোগ করে দিয়েছে। অনেক ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক গ্রামের নিকটবর্তী জনপদ এবং শহরে গমন করছে যানবাহন চালক অথবা/এবং গৃহনির্মাণে শ্রমিক হিসেবে কাজের সন্ধানে। নব্বইয়ের দশকে গ্রামাঞ্চলে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং একই সাথে চাল, শাক-সবজি ও ফলের বাজারজাতকরণ যানবাহন খাত ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। কৃষিকার্যে শ্রমিকের যোগান হ্রাস পাওয়ার এখনকার সময়ও এটাই প্রধান কারণ। অগভীর নলকূপ, পাম্প, পাওয়ার টিলার (যন্ত্রের মাধ্যমে ভূমি কর্ষণ) ও রিকশা/রিকশা ভ্যানের প্রচলন এবং তাদের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ইদানীং প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। পরিশেষে, এনজিও কর্তৃক প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের ফলে অনেক প্রান্তিক কৃষক হাস-মুরগি প্রতিপালন ও পশুপালন করে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে স্বনিয়োজিত হওয়ার মাধ্যমে নিজেদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করেছে।

কৃষি উন্নয়ন, বিশেষ করে খাদ্য উৎপাদন অবশ্য পরোক্ষভাবে দারিদ্র্য নিরসনে সাহায্য করেছে। বর্ধিত খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে যদি খাদ্যের যোগানের পরিমাণ চাহিদার চেয়ে বেশি হয়, তাহলে খাদ্যের বাজার মূল্য স্বল্প-আয়ের ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে যা খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়ক হয়। কেননা দরিদ্র জনগণ তাদের সীমিত আয়ে বাজার থেকে যে পরিমাণ খাদ্য ক্রয় করতে সক্ষম হয়, তা বহুলাংশে খাদ্যমূল্যের উপর নির্ভর করে। বিবিএস কর্তৃক পরিচালিত ২০১০ সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, গ্রামের ভূমিহীন এবং শহরের শ্রমিক শ্রেণী তাদের আয়ের ৫৯ শতাংশ খাদ্যে এবং ৩৫ শতাংশ কেবল চাল ক্রয়ে ব্যয় করে থাকে। তুলনামূলকভাবে উচ্চ আয় সম্পন্ন লোকের ক্ষেত্রে এই আনুপাতিক হার যথাক্রমে ৪৪ শতাংশ এবং ১০ শতাংশ। সুতরাং শিল্প দ্রব্যাদির তুলনায় খাদ্যশস্যের মূল্য হ্রাসের ফলে স্বভাবতই দরিদ্র জনগণ বেশি উপকৃত হয়।

কৃষি উৎপাদন, বিশেষ করে ধান উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার মধ্য-আশির দশক থেকে বেশ সন্তোষজনক ছিল। ফলে সাধারণ মূল্য সূচকের তুলনায় খাদ্যশস্যের মূল্য তুলনামূলকভাবে কম হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। চালের প্রকৃত মূল্য হ্রাস বৃহৎ কৃষকের ক্ষতির কারণ হতে পারে, কিন্তু তাতে ভূমিহীন কৃষকেরা যথেষ্ট উপকৃত হয়। ২০১০-১১ সালে একজন কৃষি শ্রমিক তার একদিনের মজুরি দিয়ে প্রায় ৩ কেজি চাল ক্রয় করতে সক্ষম হতো। চালের-সমপরিমাণ-মজুরি ২০১৬-১৭ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৪.৩ কেজিতে দাঁড়ায় (সারণি ৫)। দারিদ্র্য নিরসনে কৃষিখাতের প্রধান ভূমিকা হবে চাহিদার বৃদ্ধির হারের তুলনায় যেন খাদ্য যোগানের বৃদ্ধির হার কমপক্ষে একই পর্যায়ে থাকে, যাতে খাদ্যমূল্য স্থিতিশীল থাকে এবং স্বল্প আয়ের জনগণের ক্রয়সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে দরিদ্র জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা বিধান করাও সম্ভব হবে।

সারণি ৫: কৃষি শ্রমিকের প্রকৃত মজুরির পরিবর্তন: ২০১০/১১–২০১৬-১৭

নির্দেশক	২০১০/১১	২০১৬/১৭	পরিবর্তন (%)
মজুরি (টাকা/দৈনিক)	১০০.০০	১৪১.২২	৬.৮৭
চালের মূল্য (টাকা/কেজি)	৩৩.৪২	৩৩.১৬	-০.১৩
প্রকৃত মজুরি	২.৯৯	৪.২৬	৭.০৮

উৎস: বিবিএস এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (২০১৬)।

৩। গ্রামীণ কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড এবং ভৌত অবকাঠামো: গ্রামীণ উন্নয়নের চালিকা শক্তি[১]

৩.১। গ্রামীণ কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড

কতিপয় গবেষক (Shand, 1986; Chuta & Liedholm, 1979) গ্রামীণ এলাকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য নিরসনে গ্রামীণ কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের বিশেষ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সাম্প্রতিককালে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের গ্রামীণ এলাকায় কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের প্রভূত উন্নয়ন ঘটেছে। কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড গ্রামীণ এলাকায় ২০ থেকে ২৫ শতাংশ আয় এবং ২০ থেকে ৪০ শতাংশ কর্মসংস্থান করতে সক্ষম হয়েছে। বস্তুত কৃষি-বহির্ভূত এই কর্মকাণ্ডসমূহ গ্রামীণ এলাকায় জীবন ও জীবিকার ভিত্তি স্থাপন করতে সাহায্য করেছে (ADB, 2000)।

[১] এখানে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সারণিতে তথ্য-উপাত্তসমূহ Hossain & Bayes (2009) থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রায়োগিক গবেষণা থেকে প্রতীয়মান হয় যে নব্বইয়ের দশকে গ্রামীণ এলাকায় অকৃষি খাতের আয়ের প্রবৃদ্ধির হার কৃষি খাতের আয়ের প্রবৃদ্ধির চেয়ে অনেক বেশি ছিল। ১৯৮৮-২০০১ সময়কালে অকৃষি আয়ের প্রবৃদ্ধির হার ছিল বার্ষিক ৪.২ শতাংশ; এর তুলনায় কৃষিখাতে আয়ের প্রবৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ০.৩ শতাংশ। একইভাবে কৃষি এবং অকৃষি খাতে কর্মসংস্থানের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ১.০ এবং ২.৭ শতাংশ (Hossain, 2003; World Bank, 2005)। ফলে গ্রামীণ এলাকায় দরিদ্র জনগণ অকৃষি খাতে নিয়োজিত হয়ে তাদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়। অন্যদিকে শ্রমশক্তি কৃষিখাত থেকে অকৃষি খাতে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে কৃষিখাতে মজুরি বৃদ্ধি পায়। সুতরাং অকৃষি খাতের কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণকে দরিদ্র-বান্ধব হিসেবে গণ্য করা যায় (Hossain, 2003)।

৩.২। বাংলাদেশের অবস্থান

অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশে তার ক্রমবর্ধমান শ্রমশক্তির জন্য উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান করা একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে। গ্রাম থেকে শহরে দ্রুত অভিবাসন সত্ত্বেও কর্মক্ষম জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ শ্রমশক্তিতে যোগ দিয়েছে এবং তার অধিকাংশই গ্রামীণ এলাকায় বাস করে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে কৃষিখাতে এদের কর্মসংস্থান করা দু:সাধ্য হয়ে পড়ছে। প্রথমত, দেশে কৃষি জমি পরিমাণের বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, বরং অকৃষি খাতে জমির ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে কৃষি জমির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। দ্বিতীয়তঃ দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে চাষ নিবিড়তার পরিমাণ প্রায় সম্পৃক্ত সীমায় (২০০) পৌঁছে গেছে। তৃতীয়ত, শস্য উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি বর্তমানে বহুলাংশেই আধুনিক প্রযুক্তির প্রসারের উপর নির্ভরশীল, যার ফলে উৎপাদন-কর্মসংস্থানের স্থিতিস্থাপকতা অনেক হ্রাস পেয়েছে। অর্থাৎ জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলে কৃষিতে শ্রম উদ্বৃত্ত হয়ে পড়ছে। সবশেষে, অতীতের উন্নয়ন সত্ত্বেও কৃষিতে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির এখনও প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে, যার ফলে প্রতি একক জমিতে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়।

Hossain and Bayes (2009)-এর বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে এখানে গ্রামীণ এলাকায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত এবং দারিদ্র্য নিরসনে কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের ভূমিকার বিশদ আলোচনার চেষ্টা করা হবে। প্রধান যে বিষয়গুলি এই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(ক) গ্রামীণ এলাকায় আয় এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকল্পে কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের বিশেষ ভূমিকা,

(খ) কৃষি-বহির্ভূত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড চিহ্নিত করা এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক শ্রেণিতে তাদের গুরুত্ব, এবং

(গ) গ্রামীণ এলাকায় বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগের বিন্যাস, বিশেষ করে তাদের মূলধনের পরিমাণ এবং অর্থায়নের উৎস।

পরিশেষে, বাংলাদেশে কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের উন্নয়নকল্পে কি ধরনের নীতি প্রণয়ন এবং কৌশল অবলম্বন করা যায়, সে ব্যাপারে আলোকপাত করা হবে।

৩.৩। কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের বৈশিষ্ট্যসমূহ

জরিপের মাধ্যমে যে তথ্য-উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে, সেগুলি ব্যবহার করে কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে: (ক) কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের

আকার, প্রবৃদ্ধি এবং পেশাগত বিন্যাস, (খ) কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের সাথে খানার মোট আয়ের সম্পর্ক, (গ) কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড এবং মূলধন, (ঘ) কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড এবং কর্মসংস্থান, (ঙ) কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে খানার আয় অর্জন করা এবং (চ) বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগের বিকাশে কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের অবদান।

(ক) কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের আকার, প্রবৃদ্ধি এবং পেশাগত বিন্যাস

প্রথমেই জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার সদস্যদের প্রাথমিক (মুখ্য) এবং মাধ্যমিক (গৌণ) পেশায় নিয়োজনের সাথে কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। ২০০৮ সালের জরিপ থেকে দেখা যায়, খানার প্রায় অর্ধেক সদস্য কৃষি-সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডে প্রাথমিক পেশায় নিয়োজিত ছিল, যা ১৯৮৮ সালে ছিল প্রায় ৬৯ শতাংশ। অর্থাৎ ২০০৮ সালে খানার সদস্যগণের প্রায় অর্ধেক কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডে প্রাথমিক পেশায় নিয়োজিত ছিল, যা ১৯৮৮ সালে ছিল প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (সারণি-৬)। গ্রামীণ এলাকায় খানার সদস্যবৃন্দ ক্রমবর্ধমান হারে তাদের জীবিকার জন্য কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। একই সঙ্গে লক্ষ করা যায়, সার্বক্ষণিক পেশা হিসেবে কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত খানার এই সদস্যবৃন্দের গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার প্রতিফলন ক্রমবর্ধমান কর্মসংস্থানের মধ্যেও দেখা গেছে।

সারণি ৬: খানার সদস্যবৃন্দের প্রাথমিক (মুখ্য) পেশা: ১৯৮৮ এবং ২০০৮

প্রাথমিক (মুখ্য) পেশা	১৯৮৮		২০০৮	
	সংখ্যা	শতকরা হার (%)	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
কৃষিকাজ	৮৭৭	৪৫.৫	১৩১১	৩৯.৭
অন্যান্য কৃষিকাজ	৩৭	১.৯	৪০	১.২
কৃষি শ্রমিক	৪০১	২০.৮	৩২৫	৯.৮
কুটির শিল্প	৪৮	২.৫	৫৬	১.৭
মেকানিক/মিস্ত্রী	-	-	১২১	৩.৭
ব্যবসা	১৩৭	৭.১	৩৭৯	১১.৫
দোকান	২৮	১.৫	২৪	০.৭
চাকুরিজীবী	১১৩	৫.৯	৫১৫	১৫.৬
গৃহকর্মী	৩৭	১.৯	৩১	০.৯
রিকশা/ভ্যান	৩৪	১.৮	১৩৭	৪.২
অন্যান্য পরিবহণ	৭	০.৪	৪৬	১.৪
নির্মাণ শ্রমিক	২৪	১.৩	৪৬	১.৪
অন্যান্য অকৃষি শ্রমিক	৪৯	২.৫	৪২	১.৩
বেকার	৫০	২.৬	১৭১	৫.২
অন্যান্য*	৮৫	৪.৪	৫২	১.৬
মোট	**১৯২৭**	**১০০.০**	**৩২৯৮**	**১০০.০**

টীকা:*এখানে স্বনিয়োজিত/ব্যক্তিগত পরিষেবা, শিক্ষক/ধর্মীয় নেতা, ভিক্ষুক প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উৎস: Hossain & Bayes (2009).

উপর্যুক্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে যে সামগ্রিক ধারণা প্রদান করা হয়েছে তাতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ পড়েছে। অতীতে গ্রামীণ এলাকায় দরিদ্র জনগণের (যাদের কৃষি জমির মালিকানার পরিমাণ মাত্র ০.২ হেক্টর বা তারও কম) মাঝে যে পেশাগত পরিবর্তন ঘটেছে, সেটা প্রধানত কৃষিকাজেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এই সকল দরিদ্র জনগণ পরবর্তীকালে বহুলাংশে কৃষিখাত থেকে অকৃষিখাতে (কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডে) শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত হয় (সারণি ৭)। এটা প্রধানত সম্ভব হয়েছে অকৃষি খাতে অধিকতর মজুরি প্রাপ্তির ফলে। বৃহৎ কৃষকদের মাঝেও কৃষিখাত থেকে অকৃষি খাতে এই পেশাগত পরিবর্তন ঘটেছে, যেখানে কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডে চাকুরিজীবীদের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়।

সারণি ৭: জমির মালিকানা অনুযায়ী পেশাগত পরিবর্তনের বিন্যাস: ১৯৮৮, ২০০০, ২০০৪ এবং ২০০৮

পেশা	০.২০ হেক্টর পর্যন্ত				০.২০ হেক্টরের অধিক			
	১৯৮৮ (%)	২০০০ (%)	২০০৪ (%)	২০০৮ (%)	১৯৮৮ (%)	২০০০ (%)	২০০৪ (%)	২০০৮ (%)
কৃষি	১৬.৪০	২২.৫৮	৩১.৫২	২৭.৪১	৭১.৪৭	৬১.১৬	৬৪.৩৬	৫৯.৮১
কৃষি কাজ	১২.৬২	১৯.৩৮	২৮.৩০	২৫.৭৬	৬৮.৪৮	৬০.৯৭	৬৩.০২	৫৮.৮৯
অন্যান্য কৃষি কাজ	৩.৭৮	৩.২০	৩.২২	১.৬৫	২.৯৯	০.৪৮	১.৩৪	০.৯২
কৃষি শ্রমিক	৪১.১৭	২২.১৩	১৭.০৭	১৮.২১	৬.২২	২.২০	১.৬১	২.০৩
ব্যবসা	১২.৮৪	১৬.৩৯	১৬.৬৯	১৪.৬৮	৬.৯০	১৩.৭৭	১১.৩৪	১১.১৮
চাকুরি	১৩.৩০	১০.৬৬	১৩.৬৬	১৭.৭৮	১০.৪৮	১৪.৪৬	১৬.৪৮	১৯.৬১
অকৃষি শ্রমিক	১৬.২৮	২৮.২৪	২২.০৬	২১.৯২	৪.৯৪	৮.৪০	৬.১১	৭.৩৯
মোট	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**

উৎস: Hossain & Bayes (2009).

(খ) কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড এবং খানার মোট আয়

১৯৮৮ এবং ২০০৮ সময়কালে গ্রামীণ এলাকায় খানার আয় বার্ষিক ৩.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বর্ধিত আয়ের সিংহভাগ কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড থেকে অর্জিত হয়েছে, যা বার্ষিক প্রায় ৬.৩ শতাংশ বেড়েছে। এই সময়কালে কৃষিখাতে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ১.২ শতাংশ। এটা লক্ষণীয় যে, ২০০৮ সালে মোট আয়ে কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড থেকে আয়ের অংশ প্রায় ৫৮ শতাংশ, যা ১৯৮৮ সালে ছিল প্রায় ৪২ শতাংশ (সারণি ৮)। অর্থাৎ গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত খানার মোট আয়ে কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড থেকে অর্জিত আয়ের তুলনায় কৃষিখাতে অর্জিত আয় ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে পড়ছে। এশিয়ার অন্যান্য দেশ থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের বিশ্লেষণেও এর প্রতিফলন দেখা যায়। এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত এক জরিপ নির্দেশ করে যে গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত খানার মোট আয়ে কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড থেকে আয়ের অংশ ছিল ৫০-৭০ শতাংশ। বাংলাদেশে মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তেও এর প্রতিফলন দেখা যায় অর্থাৎ গ্রামীণ আয়ের বৃহত্তর অংশ কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড থেকেই অর্জিত হয়। এমন কি গ্রামীণ জনসংখ্যার সর্বনিম্ন পর্যায়ভুক্ত ১০ শতাংশের আয়ের ৪০ শতাংশ কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড থেকে অর্জন করা হয়। যদি এই কর্মকাণ্ডসমূহ জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহলে কৃষি খাত থেকে প্রাপ্ত জাতীয় আয়ের তুলনায় অকৃষি খাত এগিয়ে থাকবে (World Bank, 2005)। উপরন্তু, এটা ধারণা করা

যায়, এই বর্ধিত আয় প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের চাহিদা বাড়াতে যথেষ্ট সহায়তা করেছে, যেমন দানাদার শস্য ব্যতীত অন্যান্য খাদ্য এবং সেবা পণ্যের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। যেহেতু এই সকল পণ্যেও আয়-চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (income elasticity of demand) বেশ উচ্চ মাত্রায় রয়েছে বলে গণ্য করা হয় এবং এই স্থিতিস্থাপকতার পরিমাণ শহরের তুলনায় গ্রামীণ এলাকায় বেশি, সেহেতু এটা যুক্তিসংগত বলে মনে হয় যে কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড থেকে অর্জিত আয় দেশের অর্থনীতিতে আন্তঃখাত সংযোগ এবং বহমুখী প্রভাব বিস্তার করে (Hossain, 2003; World Bank, 2005)।

সারণি-৮: গ্রামীণ এলাকায় খানার আয়ের কাঠামোগত বিন্যাস: ১৯৮৮, ২০০৪ এবং ২০০৮

আয়ের উৎস	খানার আয় (মার্কিন ডলার/বার্ষিক)			মোট আয়ের অংশ		
	১৯৮৮	২০০৪	২০০৮	১৯৮৮	২০০৪	২০০৮
কৃষি	**৫৮৪**	**৫১৫**	**৭২৩**	**৫৮.৫**	**৪৫.০**	**৪৪.৫**
ধান চাষ	২৬৩	১৭৭	২৫৪	২৬.৩	১৬.৪	১৬.৩
ধান ব্যতীত অন্যান্য শস্য চাষ	৮১	১২৯	১৮০	৮.১	১১.০	১০.৮
মৎস্য ব্যতীত অন্যান্য উপখাত	১০৯	১৪৩	১৮১	১০.৯	১১.০	১০.৯
কৃষি মজুরি	১৩২	৬৬	১০৮	১৩.২	৬.৬	৬.৫
অকৃষি	**৪১৫**	**৬৩২**	**৯৪০**	**৪১.৫**	**৫৫.০**	**৫৫.৫**
ব্যবসা এবং বাণিজ্য	৯৪	২৪৬	২০৮	৯.৪	২১.৪	১৩.৫
চাকুরি	১৭৭	১৪৪	১৬২	১৭.৭	১২.৬	৯.৭
প্রেষিতক (প্রেরিত অর্থ)	৫১	১৬৬	৩৭৮	৬.১	১৪.৪	২২.৭
অকৃষি খাতে মজুরি	৯৩	৭৬	১৫২	৯.৩	৬.৬	৯.৬
মোট আয়	**৯৯৯**	**১১৪৭**	**১৬৬৩**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**
খানার আয়তন	৬.৮৯	৬.০৮	৪.৯৪	-	-	-
মাথাপিছু আয়	১৭৩	২৩৭	৩৪৮	-	-	-

উৎস: Hossain & Bayes (2009).

(গ) অকৃষি খাতে কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের ফলে মূলধন গঠন

শুধু আয় বৃদ্ধিতে নয়, মূলধন গঠনেও কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, ১৯৮৮ সালে গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত খানার মোট মূলধনের প্রায় ৫৩ শতাংশ কৃষি খাত থেকে সংগৃহীত হতো; অকৃষি খাত থেকে প্রায় ৪৭ শতাংশ। পরবর্তীকালে কৃষি খাতে মূলধন মাত্র ৩০ শতাংশে হ্রাস পায় এবং অকৃষি খাতে মূলধন বৃদ্ধি পেয়ে ৭০ শতাংশে দাঁড়ায় (সারণি ৯)। কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের মাঝে পরিবহণ খাতের প্রবৃদ্ধি লক্ষণীয়, যা বহুলাংশে গ্রামীণ এলাকায় ভৌত অবকাঠামো, বিশেষ করে সরকার কর্তৃক রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং এনজিও কর্তৃক ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের ফলে সম্ভব হয়েছে। বস্তুত এই সময়কালে খানা প্রতি মূলধনের পরিমাণ মার্কিন ডলার ১৯৬ থেকে মার্কিন ডলার

৪৭০ বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণি ৯)। এই তথ্য-উপাত্ত থেকে প্রতীয়মান হয় যে গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত খানার আয়ের সিংহভাগ বর্তমানে কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড থেকে অর্জিত হয়, যা খানার মালিকদের কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করে (Hossain & Bayes, 2009)।

সারণি ৯: গ্রামীণ এলাকায় মূলধন গঠনে অকৃষি খাতের অংশ

খাত	মোট মূলধনের অংশ (শতাংশ)	
	১৯৮৮	২০০৮
কৃষি	৫৩.৩	২৯.৯
পরিবহণ	১৩.৫	৩৩.৮
শিল্প	৩৩.২	৩৬.৩
মোট	**১০০.০**	**১০০.০**
আর্থিক পরিমাণ (খানাপ্রতি, মার্কিন ডলার)	১৯৬	৪৭০

উৎস: Hossain & Bayes (2009).

(ঘ) কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড এবং কর্মসংস্থান

১৯৮৮ এবং ২০০৮ সময়কালে কৃষি এবং অকৃষি খাতের কর্মকাণ্ডের মধ্যে গতিময়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই গতিময়তা একমুখী ছিল; কৃষি খাত থেকে কর্মকাণ্ড কৃষি-বহির্ভূত খাতে স্থানান্তর হয়েছে। প্রাথমিক/প্রধান পেশায় যারা নিয়োজিত এই সময়কালে কৃষি খাতের কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ হ্রাস পেয়েছে এবং কৃষিকর্মে নিয়োজিত শ্রমিকের অনুপাত প্রায় অর্ধেক হয়েছে। কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের মধ্যে রিকশা/ভ্যান চালানো এবং স্বনিয়োজিত কাজের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। গ্রামীণ এলাকায় রাস্তাঘাটের সম্প্রসারণ, অগভীর নলকূপের ব্যাপক ব্যবহার এবং যন্ত্রচালিত জমিচাষ ক্রমান্বয়ে শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে। চাকুরিজীবীদের অংশগ্রহণের হার ১৯৮৮ সালের প্রায় ৭ শতাংশ থেকে ২০০৮ সালে প্রায় ১৭ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। উপরন্তু, ব্যবসায়ে নিয়োজিত লোকের অংশগ্রহণও ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে – ১৯৮৮ সালের ৭.১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৮ সালে ১১.৫ শতাংশে দাড়িয়েছে (Hossain & Bayes, 2009)।

গ্রামীণ এলাকায় মানবসম্পদের উন্নয়ন কৃষি খাত থেকে অকৃষি খাতে পেশাগত পরিবর্তনে সাহায্য করেছে। জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত থেকে লক্ষ করা যায়, গ্রামের বিদ্যালয়ে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির হার যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। তদুপরি বয়সের বিবেচনায় শ্রমশক্তিতে অন্তর্ভুক্তির দাবিদার এমন জনসংখ্যার বিদ্যালয়ে পাঠরত গড় বছরের পরিমাণও বেড়েছে। কিন্তু যাদের বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ হয়নি তারা স্বভাবতই কৃষিকাজেই (যাদের জমির মালিকানা রয়েছে) নিয়োজিত থাকে অথবা কৃষিতে দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে কাজ করে, বিশেষ করে ভূমিহীন এবং প্রান্তিক কৃষকেরা। অথচ যারা মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে অথবা সফল হয়েছে তাদের পক্ষে কৃষিকাজ থেকে অধিকতর লাভজনক চাকুরি অথবা ব্যবসায়ে নিয়োজিত হওয়া সম্ভব হয়েছে (সারণি ১০ এবং সারণি ১১)।

সারণি ১০: গ্রামীণ এলাকায় শ্রমজীবীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিবর্তন

শিক্ষাগত অবস্থান	১৯৮৮		২০০০		২০০৮	
	সংখ্যা	অংশ (%)	সংখ্যা	অংশ (%)	সংখ্যা	অংশ (%)
অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা	১,১২৯	৫১.৯৩	৯৯৮	৩৪.০৭	১,১৫৭	৩৪.৫০
প্রাথমিক	৫৫৮	২৬.৬৭	৯৫৪	৩২.৫৭	৯২৫	২৭.৫৮
মাধ্যমিক পর্যায়ে ঝরে পড়া	২৭৩	১২.৫৬	৫৬২	১৯.১৯	৭৬৯	২২.৯৩
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট/প্রত্যয়নপত্র	২১৪	৯.৮৪	৪১৫	১৪.১৭	৫০৩	১৬.০০
মোট	**২,১৭৪**	**১০০.০০**	**২,৯২৯**	**১০০.০০**	**৩,৩৫৪**	**১০০.০০**

উৎস: Hossain & Bayes (2009).

সারণি ১১: বিভিন্ন পর্যায়ে ছাত্রদের অংশগ্রহণ

শিক্ষাগত পর্যায় (বয়সের ক্রম অনুসারে)	১৯৮৮		২০০০		২০০৮	
	সংখ্যা	অংশ (%)	সংখ্যা	অংশ (%)	সংখ্যা	অংশ (%)
প্রাথমিক (৬-১০ বৎসর)	৪৪৯	৬৩.৪০	৬০৫	৮৮.০৬	৫৭৫	৯১.৭১
মাধ্যমিক (১১-১৬ বৎসর)	৩৯৩	৬৩.১০	৫৫৩	৬৭.৬৯	৫০৩	৭৪.৯৬
কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় (১৭-২৪ বৎসর)	১০৫	২৪.৭৬	২২৪	৩০.৪৮	১৮৩	২৬.৬৮

উৎস: Hossain & Bayes (2009).

(ঙ) গ্রামীণ এলাকায় শিল্পোদ্যোগ

কৃষি উৎপাদনের উপকরণ এবং শস্য-উৎপাদন সম্পর্কিত উদ্যোগ মোট শিল্পোদ্যোগের এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক (প্রায় ৩৫ শতাংশ) কিন্তু তা এই শিল্পোদ্যোগে বিনিয়োগকৃত মোট মূলধনের মাত্র ১৭ শতাংশ। প্রাণীসম্পদ, মৎস্যসম্পদ এবং বনসম্পদ সম্পর্কিত উদ্যোগ গ্রামীণ এলাকার মোট শিল্পোদ্যোগের প্রায় ১৭ শতাংশ এবং মোট মূলধনের প্রায় ১৩ শতাংশ (সারণি ১২)। কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাত সম্পর্কিত উদ্যোগ মোট শিল্পোদ্যোগের মাত্র ৬ শতাংশ এবং মোট মূলধনেও এদের অনুপাত একই পর্যায়ে ছিল। অর্থাৎ ২০০০ সালে প্রায় ৫৮ শতাংশ শিল্পোদ্যোগ ছিল কৃষি সম্পর্কিত। মোট শিল্পোদ্যোগে মুদির দোকান যা নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগের পণ্য সরবরাহ করে থাকে, তার অংশ প্রায় ১৪ শতাংশ। যে সকল শিল্পোদ্যোগ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ মূলধন বিনিয়োগ করে থাকে তাদের মধ্যে পরিবহণ ব্যবসা (১০.৫ শতাংশ), পোশাকশিল্প (১৬.৮ শতাংশ) এবং নির্মাণ সামগ্রীর কেনা-বেচা (১০.১ শতাংশ) উল্লেখযোগ্য।

সারণি ১২: বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্যের গুরুত্ব এবং মূলধনের গড় পরিমাণ: ২০০০

ব্যবসা বাণিজ্যের ধরন	ব্যবসা বাণিজ্যের অংশ (সংখ্যা=৫৬৬)	মূলধনের অংশ (%)	বিগত বছরের বিনিয়োগের অংশ (%)	মূলধনের গড় পরিমাণ (টাকা)
কৃষি উৎপাদনের উপকরণ	১৪.১	৮.৫	৬.৬	২৮,৩৮৪
শস্য উৎপাদন	২০.৭	৮.২	১৬.৮	১৮,৬৪৬
প্রাণী সম্পদ	৬.০	৭.২	১৬.০	৫৬,৯৮০
মৎস্য সম্পদ	৪.৮	২.১	২.৮	২০,৭২৬
বনজ সম্পদ	৬.৪	৩.৮	৪.৭	২৮,৩৪৭
কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য	৬.২	৬.৩	১.৭	৪০,৪৩৪
নির্মাণ সামগ্রী	৪.৯	১০.১	১২.৫	৯৬,৩২১
পরিবহণ ব্যবসা	৪.১	১০.৫	৩.৫	১২২,৬০৪
রেস্তোরাঁ	৬.৭	২.১	০.৯	১৪,৪৮৩
পোশাক শিল্প	৩.৭	১৬.৮	৯.৯	২০০,৮১০
মুদির দোকান	১৩.৮	১১.২	১৯.৯	৩৮,৩৬৫
অন্যান্য অকৃষি কর্মকাণ্ড	৮.৭	১৬.৩	৬.৬	৮৩,৪৩৯
মোট	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**৪৭,২৬২**

উৎস: Hossain & Bayes (2009).

গ্রামীণ এলাকায় বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগে গড়ে মূলধনের পরিমাণ ছিল অপেক্ষাকৃত কম; ২০০৮ সালে যার পরিমাণ ছিল ৩৪৯ মার্কিন ডলার (সারণি-১৩)। নির্মাণ সামগ্রীতে মূলধনের পরিমাণ ছিল সবচেয়ে বেশি (৫,২৪৮ মার্কিন ডলার); এর পরে মৎস্য সম্পদ (৪৬৫ মার্কিন ডলার) এবং পরিবহণ ব্যবসা (৩৬৪ মার্কিন ডলার)। রেস্তোরাঁ (৯৭ মার্কিন ডলার) এবং শস্য উৎপাদনে (১৫২ মার্কিন ডলার) মূলধনের পরিমাণ ছিল সবচেয়ে কম। সার্বিক বিবেচনায় কৃষি খাতে বাণিজ্যিক বিনিয়োগের পরিমাণ গ্রামীণ এলাকায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগের ৪৫-৫০ শতাংশ ছিল বলে গণ্য করা যায়। এটা নির্দেশ করে যে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে কৃষির প্রবৃদ্ধির নিবিড় সংযোগ রয়েছে।

সারণি ১৩: বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্যের গুরুত্ব এবং মূলধনের গড় পরিমাণ: ২০০৮

ব্যবসা বাণিজ্যের ধরন	ব্যবসা বাণিজ্যের অংশ (সংখ্যা=৪২৭)	মূলধনের অংশ (%)	বিগত বছরের বিনিয়োগের অংশ (%)	মূলধনের গড় পরিমাণ (মার্কিন ডলার)
কৃষি উৎপাদনের উপকরণ	২.৬	১.২	৬.৬	২০৭
শস্য উৎপাদন	১৭.৮	৭.২	১৬.৮	১৫২
প্রাণী সম্পদ	৪.০	৩.৪	১৬.০	২৯৮
মৎস্য সম্পদ	৬.৬	৮.৭	২.৮	৪৬৫
বনজ সম্পদ	৬.১	৬.৩	৪.৭	৩০৪
কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য	৭.৫	৬.৯	১.৭	৩২০
নির্মাণ সামগ্রী	২.০	৩৬.২	১২.৫	৫২৪৮

(চলমান সারণি ১৩)

ব্যবসা বাণিজ্যের ধরন	ব্যবসা বাণিজ্যের অংশ (সংখ্যা=৪২৭)	মূলধনের অংশ (%)	বিগত বছরের বিনিয়োগের অংশ (%)	মূলধনের গড় পরিমাণ (মার্কিন ডলার)
পরিবহণ ব্যবসা	১.৯	২.০	৩.৫	৩৬৪
রেস্তোরাঁ	৯.৪	২.৬	০.৯	৯৭
পোশাক শিল্প	৬.৮	৪.৪	৯.৯	২২৯
মুদির দোকান	২৬.১	১৩.৩	১৯.৯	১৮৩
অন্যান্য অকৃষি কর্মকাণ্ড	১০.১	৯.১	৬.৬	৩১৭
মোট	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**৩৪৯**

উৎস: Hossain & Bayes (2009).

এটা লক্ষণীয় যে, ব্যবসা বাণিজ্যে বিনিয়োগকৃত মূলধনের অধিকাংশ পরিমাণ নিজস্ব সঞ্চয় থেকে অর্থায়ন করা হয়। সুতরাং গ্রামীণ এলাকায় কৃষি-বহির্ভূত শিল্পোদ্যোগের উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক মূলধন কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলে যে উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হয় সেখান থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে (সারণি ১৪)। অন্যদিকে ২০০০ সালে আনুষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে এই শিল্পোদ্যোগের জন্য সংগৃহীত মূলধনের পরিমাণ ছিল তুলনামূলকভাবে কম, যদিও তা পরবর্তীকালে বৃদ্ধি পেয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ২০০০ সালে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ হিসেবে প্রাপ্ত প্রাথমিক মূলধনের পরিমাণের মাত্র ১১ শতাংশ ছিল; কিন্তু ২০০৮ সালে তা তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণি ১৪)। বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি পেয়েছে সেই সব শিল্পোদ্যোগ যাতে শস্য উৎপাদন (১৬.২ শতাংশ), মুদির দোকান (২১.২ শতাংশ), নির্মাণ কাজ (১৪.৮ শতাংশ) এবং মৎস্য সম্পদ (১৪.৪ শতাংশ) অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এনজিও থেকে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য (১৬.০ শতাংশ), এবং বন সম্পদ (১০.৭ শতাংশ) শিল্পোদ্যোগে বেশি বিনিয়োগ করা হয় (সারণি ১৪ এবং সারণি ১৫)। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, ঋণের অপ্রতুলতা গ্রামীণ এলাকায় কৃষি-বহির্ভূত শিল্পোদ্যোগ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে (Hossain & Bayes, 2009)।

সারণি-১৪: প্রাথমিক মূলধন এবং বিনিয়োগের (গত বছর) উৎস: ২০০০ এবং ২০০৮

মূলধন/পূজির উৎস	প্রাথমিক মূলধন		গত বছরের বিনিয়োগ (%)	
	২০০৮	২০০০	২০০৮	২০০০
বাণিজ্যিক ব্যাংক	৩২.২১	১০.৯	৯.৫৫	৯.৩
এনজিও	২৩.৬৭	২.৬	৪.৩৯	৪.৪
মহাজন	০.২৫	৩.৭	০.১৪	৯.১
বন্ধু এবং আত্মীয়স্বজন	৬.৫৪	৬.০	৩.৮০	২.২
নিজস্ব সঞ্চয়	৩০.১২	৭১.৬	৪৯.০৭	৭০.২
সম্পদের নির্বিনিয়োগ (disinvestment)	৪.৭০	৬.২	১৯.৬৯	৭.৯
প্রেষিতক (প্রেরিত অর্থ)	০.৬২	-	১০.৪৬	(-)
অন্যান্য	১.৮২	-	২.৪৫	(-)
মোট	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**

উৎস: Hossain & Bayes (2009).

সারণি ১৫: শিল্পোদ্যোগের অর্থায়নে বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং এনজিও থেকে প্রাপ্ত ঋণের অংশ, ২০০০

ব্যবসার ধরন	বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ঋণ	এনজিও থেকে প্রাপ্ত ঋণ	নিজস্ব সঞ্চয়
কৃষি উৎপাদনের উপকরণ	৪.৯	১.৮	৬৮.১
শস্য উৎপাদন	১৬.২	৬.৫	৬৬.৯
প্রাণী সম্পদ	৪.৪	২.৯	৯০.৮
মৎস্য সম্পদ	১৪.৪	৭.২	৪১.৮
বনজ সম্পদ	৯.৯	১০.৭	৪২.৯
কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য	৮.৯	১৬.০	৭৬.০
নির্মাণ কাজ	১৪.৮	১.৯	৬১.৩
পরিবহণ	৯.৭	৩.০	৮৬.৩
রেস্তোরাঁ	৩.৫	৪.৮	৬৮.৭
পোশাক শিল্প	৬.৯	৩.৯	৮৪.৭
মুদির দোকান	২১.২	০.৬	৫৮.৪
অন্যান্য অকৃষি কর্মকাণ্ড	০.৬	০.০	৯৩.৩

উৎস: Hossain & Bayes (2009).

৪। বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের সহায়তাকল্পে কতিপয় কৌশল এবং নীতিমালা

গ্রামীণ শিল্পের উপর গবেষকবৃন্দ এই খাতের অগ্রগতির প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে কতিপয় উপাদান চিহ্নিত করেছেন: অর্থায়নের সমস্যা, শিল্প/বাণিজ্য উদ্যোক্তার অভাব, সনাতন প্রযুক্তি, পণ্যের নিম্নমান, অপর্যাপ্ত ভৌত কাঠামো, বাজারজাতকরণের সমস্যা এবং বৈষম্যমূলক সামষ্টিক নীতি অনুসরণ করার ফলে মাঝারি এবং বৃহৎ শিল্পের সাথে অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়া (Ahmed, 1984; Mandal & Asaduzzaman, 2002)। এই সকল প্রতিবন্ধকতার অধিকাংশ পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রথম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা দলিল (১৯৫৫-৬০) প্রণয়ন করার সময়ে শনাক্ত করা হয় এবং পরবর্তীকালে প্রণীত সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা দলিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সরকার কর্তৃক এই সময়কালে কতিপয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়, যেমন বাংলাদেশ কুটির শিল্প কর্পোরেশন, তাঁতশিল্প বোর্ড এবং রেশম চাষ সম্পর্কিত বোর্ড, যাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা যায়। কিন্তু পর্যাপ্ত অর্থায়ন এবং সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে এই সকল সংস্থার কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালে বাংলাদেশ সরকারও গ্রামীণ এলাকায় কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব অনুধাবন করে, বিশেষ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার ব্যাপারে। অকৃষি খাতের উন্নয়নের কৌশল হিসেবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দলিলসমূহ গ্রামের বিভিন্ন পণ্য বিপণন এলাকায় "প্রবৃদ্ধির কেন্দ্রবিন্দু" (Growth Centres) হিসেবে স্থাপন করার জন্য সুপারিশ করে। বস্তুত বিকাশের এই কেন্দ্রবিন্দুর আশেপাশে বিভিন্ন ধরনের গ্রামীণ শিল্প প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গ্রামের পরিবহণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, কৃষি কার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি উৎপাদন, ফসল কাটার পরবর্তী পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাত করা এবং

তাঁতশিল্পের আধুনিকায়নের জন্য যন্ত্রপাতি। গ্রামীণ এলাকায় শিল্প উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য কতিপয় মৌলিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান যেমন প্রবৃদ্ধির কেন্দ্রবিন্দুতে যন্ত্রপাতি মেরামত সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার প্রস্তাব করা হয়। এছাড়াও প্রারম্ভিক পর্যায়ে সরকারি খাতে এবং অর্থায়নে ২০০ ওয়ার্কশপ প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা করা হয় যাতে পরবর্তীকালে বেসরকারি খাত এ ব্যাপারে উৎসাহিত হয়। বস্তুত পরবর্তী পর্যায়ে এই ওয়ার্কশপগুলি আগ্রহী বেসরকারি শিল্প উদ্যোক্তাদের নিকট বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড উন্নয়নকল্পে গবেষকবৃন্দ কতিপয় নীতিমালা সুপারিশ করেছে, যা এখানে প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত, শিক্ষা, বিদ্যুৎ ও ঋণের অধিগম্যতা এবং পণ্যের বাজারজাতকরণের সমস্যা দূরীকরণ। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার প্রসার, ভৌত কাঠামোর উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের লভ্যতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কেননা কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এই সকল উপাদানের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। মোদ্দা কথা, অকৃষি খাতকে পূর্বের ন্যায় আর অবশিষ্ট (residual) খাত হিসেবে গণ্য করা যাবে না কারণ বর্তমানে এই খাতে অর্ধেকেরও বেশি শ্রমশক্তি নিয়োজিত রয়েছে এবং তা ক্রমবর্ধমান। এখানে উল্লেখ্য যে, দরিদ্র লোকজন ঋণ, শিক্ষা এবং বিদ্যুতের অধিগম্যতার অভাবে তুলনামূলক কম উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রয়েছে।

পরিশেষে, এই প্রসঙ্গে Otsuka and Estidillic (2007) এর কতিপয় মূল্যবান মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ এবং ভারত থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে গবেষকবৃন্দ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, গ্রামীণ এলাকার দারিদ্র্য প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে নির্ধারিত হয় প্রধানত কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড, বিশেষ করে শ্রমবাজার থেকে অতিরিক্ত আয় অর্জনের ফলে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি উপকারভোগী সেসব লোকজন যারা সবুজ বিপ্লবের ফলে কৃষি কাজ থেকে অর্জিত অতিরিক্ত আয় তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় বিনিয়োগ করেছে। সুতরাং এখানে নীতি প্রণয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে দেশের সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় কৃষিখাত অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে যা বিনিয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়তা করে, যা পরবর্তীতে গ্রামীণ এলাকায় শ্রমশক্তিকে কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে অতিরিক্ত আয় অর্জনে সাহায্য করে। কৃষিখাত থেকে অকৃষিখাত এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের মাঝে নিম্নোক্ত যোগসূত্র রয়েছে (চিত্র ১)।

চিত্র ১: কৃষি উন্নয়ন, অকৃষি খাতে কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড এবং মানব সম্পদের মাঝে যোগসূত্র

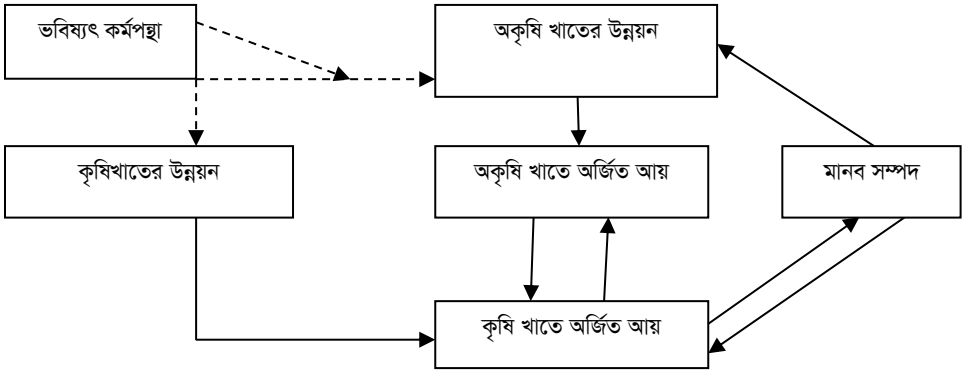

উৎস: Hossain & Bayes (2009) কর্তৃক Otsuka & Estidillo (2007) থেকে অভিযোজিত করা হয়েছে।

৫। গ্রামীণ উন্নয়নে ভৌত অবকাঠামোর ভূমিকা

(ক) ভৌত অবকাঠামোর অধিগম্যতা

গ্রামীণ এলাকায় জনগণের জীবন ও জীবিকার উপর ভৌত অবকাঠামোর কি ধরনের প্রভাব পড়েছে তার মূল্যায়নের জন্য Hossain and Bayes (2009) কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানা এবং গ্রামসমূহকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়: (ক) "উন্নত" গ্রাম/খানা যেখানে পাকা করে বাধানো রাস্তা এবং বিদ্যুৎ উভয়েরই অধিগম্যতা রয়েছে; (খ) "অর্ধ-উন্নত" গ্রাম/খানা যেখানে পাকা করে বাধানো রাস্তা অথবা বিদ্যুতের অধিগম্যতা রয়েছে; এবং (গ) "অনুন্নত" গ্রাম/খানা যেখানে পাকা করে বাধানো রাস্তা এবং বিদ্যুৎ কোনোটারই অধিগম্যতা নেই। জরিপে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত থেকে দেখা যায়, বিগত দুই দশকে "উন্নত" গ্রামের অনুপাত (সংখ্যা এবং শতাংশ বিচারে) তিনগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং "অর্ধ-উন্নত" ও "অনুন্নত" গ্রামের অনুপাত হ্রাস পেয়েছে (সারণি ১৬)। অর্থাৎ ভৌত অবকাঠামোর অধিগম্যতা গ্রামীণ এলাকায় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। আশি এবং নব্বইয়ের দশকে গ্রামীণ এলাকায় পাকা করে বাধানো রাস্তার যে ব্যাপক প্রসার ঘটেছে তা থেকেই এটা অনুধাবন করা যায়। দুর্ভাগ্যবশত এই প্রসার ঘটেছে অত্যন্ত ধীর গতিতে। জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত এটা নির্দেশ করে যে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ গ্রামে পাকা করে বাধানো রাস্তা এবং বিদ্যুতের অধিগম্যতা রয়েছে এবং এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি গ্রামে কোনোটারই অধিগম্যতা নেই। অর্থাৎ অন্তত এক-তৃতীয়াংশ গ্রাম এখনও (২০০৮ সালে) অনুন্নত, যা পাকা করে বাধানো রাস্তা এবং বিদ্যুৎ উভয় সুবিধা থেকেই বঞ্চিত। যেহেতু আয় এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে এদের অবদান অপরিহার্য, তাই গ্রামীণ উন্নয়ন পরিকল্পনায় এদের দ্রুত প্রসার ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

সারণি ১৬: গ্রামীণ এলাকায় ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন

নির্দেশক	১৯৮৮		২০০৮	
	গ্রামের সংখ্যা	শতাংশ (%)	গ্রামের সংখ্যা	শতাংশ (%)
উন্নত	৬	১০	২০	৩২
অর্ধ-উন্নত	২৩	৩৭	২১	৩৪
অনুন্নত	৩৩	৫৩	২১	৩৪
মোট	**৬২**	**১০০**	**৬২**	**১০০**

উৎস: Hossain & Bayes (2009)।

(খ) ভৌত অবকাঠামো এবং শস্য উৎপাদন

জরিপে অন্তর্ভুক্ত গ্রামসমূহ থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং শস্য উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির যে নিবিড় সংযোগ রয়েছে, সেদিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। এটা পরিষ্কার যে পাকা রাস্তা এবং বিদ্যুতের অধিগম্যতা শস্য উপখাতকে প্রভাবিত করে, কেননা উৎপাদনের উপকরণ সংগ্রহ এবং শস্য বাজারজাতকরণ উভয়ই উপরোল্লিখিত দুইটি উপাদানের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। এখানে ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন শস্যের নিবিড়তা, কৃষিজমিতে সেচের ও আধুনিক প্রযুক্তির প্রসার এবং ধানের ফলনের পরিমাণ কীভাবে ও কতখানি প্রভাবিত করেছে তার বিশদ আলোচনা করা হবে।

অর্ধ-উন্নত এবং অনুন্নত গ্রামসমূহের তুলনায় উন্নত গ্রামসমূহে ২০০৮ সালে শস্য নিবিড়তার পরিমাণে আধিক্য লক্ষ করা যায়। অথচ দুই দশক পূর্বে অর্থাৎ ১৯৮৮ সালে উন্নত গ্রামসমূহ শস্য নিবিড়তার ক্ষেত্রে অর্ধ-উন্নত এবং অনুন্নত গ্রামসমূহের তুলনায় পিছিয়ে ছিল। কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়, পাকা রাস্তার অধিগম্যতার ফলে উন্নত গ্রামসমূহ অন্যান্য গ্রামের তুলনায় উৎপাদনের উপকরণসমূহ সঠিক সময়ে এবং সঠিক মূল্যে পায়। এছাড়া উন্নত গ্রামসমূহ পণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে (সারণি-১৭)। দ্বিতীয়ত, উৎকৃষ্ট ভৌত অবকাঠামোর ফলে উন্নত গ্রামসমূহে সেচকৃত চাষের জমির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হয়। উপরন্তু আধুনিক প্রযুক্তি প্রচলন এবং প্রসারের ক্ষেত্রেও (যেমন উফশী ধানের প্রচলন এবং প্রসার) ২০০৮ সালে উন্নত গ্রামসমূহ অন্যান্য গ্রাম থেকে অনেক এগিয়ে ছিল বলে লক্ষ করা যায়। একথা বলাই বাহুল্য যে, ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়নের ফলে এই সকল উন্নত গ্রামসমূহে সঠিক সময়ে উৎপাদনের উপকরণ প্রাপ্তি এবং পণ্য বাজারজাত করণের সুযোগ-সুবিধা লাভ করে থাকে। পরিশেষে, উন্নত গ্রামসমূহে ধানের ফলন ১৯৮৮-২০০৮ সময়কালে প্রায় ৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়; স্বভাবতই অন্যান্য দুই শ্রেণির (অর্ধ-উন্নত এবং অনুন্নত) গ্রামের তুলনায় বেশি (সারণি-১৭)। সুতরাং গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামোর সঙ্গে (যেমন- পাকা রাস্তা ও বিদ্যুৎ) উৎপাদনশীলতার এক নিবিড় সংযোগ লক্ষ করা যায় (Hossain & Bayes (2009)।

সারণি ১৭: শস্য উৎপাদনে গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামোর প্রভাব

নির্দেশক	১৯৮৮			২০০৮		
	উন্নত	অর্ধ-উন্নত	অনুন্নত	উন্নত	অর্ধ-উন্নত	অনুন্নত
শস্য নিবিড়তা	১৫৯	১৬২	১৭৩	১৮৩	১৮১	১৬৫
ধানের শস্য নিবিড়তা	১৩৭	১১৭	১৩৬	১২২	১৩২	১২০
সেচের প্রসার	৪০	২১	২২	৮৯	৭০	৭৮
উফশী ধানের প্রসার	৪০	৩৯	৩০	৮৯	৮২	৮৮
ধানের ফলন (টন/হেক্টর প্রতি)	২.৬	২.৫	২.৪	৩.৮	৩.৪	৩.৬

টীকা: * = মোট চাষকৃত জমির অংশ এবং ** = মোট ধানী জমির অংশ

উৎস: Hossain & Bayes (2009)।

(গ) ভৌত অবকাঠামো এবং সম্পদের অধিগম্যতা

গ্রামীণ এলাকায় বসবাসরত জনগণের কল্যাণ বহুলাংশে নির্ভর করে কী পরিমাণ সম্পদ তারা সঞ্চয়ন করতে পেরেছে। সম্পদের এই সঞ্চয়ন (accumulation) কৃষি এবং অকৃষি উভয় খাতেই হতে পারে। এটা লক্ষ করা যায় যে উন্নত গ্রামসমূহে কৃষি খাতে সঞ্চিত সম্পদের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম, এমনকি এই সম্পদের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু অকৃষি খাতে সঞ্চিত সম্পদের পরিমাণ সকল গ্রামেই বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও উন্নত গ্রামসমূহে সম্পদের পরিমাণের প্রবৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। অর্থাৎ যেখানে ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন অধিক মাত্রায় ঘটেছে, সেখানে অকৃষি সম্পদের পরিমাণ বেশি। অন্যদিকে গ্রামীণ এলাকায় ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক খাত হতে ঋণের অধিগম্যতা অনেক বৃদ্ধি পায়। বস্তুত এই পরিবর্তন সব গ্রামেই লক্ষ্য করা যায় কিন্তু স্বভাবতই উন্নত গ্রামসমূহে এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অর্থাৎ খানাপ্রতি ঋণের পরিমাণের লভ্যতা তুলনামূলকভাবে উন্নত গ্রামে বেশি (সারণি-১৮)।

সারণি ১৮: সম্পদের সঞ্চয়নে ভৌত অবকাঠামোর প্রভাব

নির্দেশক	১৯৮৮			২০০৮		
	উন্নত	অর্ধ-উন্নত	অনুন্নত	উন্নত	অর্ধ-উন্নত	অনুন্নত
কৃষি খাতে সম্পদ (মার্কিন ডলার)	২১৬	১৪৭	১৪৪	২২৮	৩২৫	৫২৩
অকৃষি খাতে সম্পদ (মার্কিন ডলার)	২৩১	১৭৬	১৫২	৬৪৪	২৫৪	২০৪
প্রাতিষ্ঠানিক খাত থেকে খানার ঋণপ্রাপ্তি (%)	৩	১০	১৫	৩৬	৩৭	৪২
খানাপ্রতি প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের পরিমাণ (মার্কিন ডলার)	৫	১৫	১৮	১৩৪	৭৩	৮৭
খানার আয় অর্জনকারী প্রতি সদস্যের বিদ্যালয়ে লেখাপড়ায় অংশগ্রহণ (গড় বছরের হিসাবে)	৩.০	৩.৬	৩.৩	৪.৮	৫.০	৪.৬
খানার শ্রমজীবীর অকৃষি খাতের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ (%)	৪৪	৩৬	৩৪	৫৮	৪৯	৫২

উৎস: Hossain & Bayes (2009)।

এটা লক্ষণীয় যে, গ্রামীণ এলাকায় ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে সাথে অকৃষি খাতের কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত শ্রমজীবীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাকা রাস্তা এবং বিদ্যুতের অধিগম্যতা প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের লভ্যতা বাড়িয়েছে এবং কৃষি ও কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের সংযোগ শক্তিশালী করেছে। উন্নত গ্রামসমূহে কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের প্রসারের সম্ভবত এটাই প্রধান কারণ।

(ঘ) ভৌত অবকাঠামো এবং সম্পদের উৎপাদনশীলতা

সম্পদের সঞ্চয়ন গ্রামীণ এলাকায় খানার সদস্যদের কল্যাণের জন্য একটি আবশ্যকীয় শর্ত মাত্র; পর্যাপ্ত শর্ত সঞ্চিত সম্পদের উৎপাদনশীলতা। যখন সম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় (ইউনিট প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে) তখন খানার সদস্যবৃন্দ অপ্রতুল সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের আর্থিক অবস্থা উন্নতির সুযোগ পায়। এখানে লক্ষণীয় যে অর্ধ-উন্নত এবং অনুন্নত গ্রামসমূহের তুলনায় উন্নত গ্রামে মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধির হার বেশি (সারণি ১৯)। বস্তুত মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধির হার ছিল উন্নত গ্রামসমূহে প্রায় ৫ শতাংশ যেখানে অন্যান্য গ্রামসমূহে এই প্রবৃদ্ধির হার ৩-৪ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। উল্লেখ্য, ১৯৮৮ সালে উন্নত গ্রামসমূহে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ অন্যান্য গ্রামসমূহের বিশেষ করে অর্ধ-উন্নত গ্রামসমূহের তুলনায় কম ছিল; কিন্তু পাকা রাস্তা এবং বিদ্যুতের অধিগম্যতার ফলে তাদের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন খানার সদস্যদের অতিরিক্ত আয় অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং পণ্য বাজারজাতকরণের সুযোগও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং নীতি প্রণয়নের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটা বলা যেতে পারে যে গ্রামীণ এলাকায় খানার সদস্যদের আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করার ব্যাপারে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের কোনো কার্যকর বিকল্প নেই বললেই চলে।

সারণি-১৯: সম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে ভৌত অবকাঠামোর প্রভাব

নির্দেশক	২০০৮			১৯৮৮		
	উন্নত	অর্ধ-উন্নত	অনুন্নত	উন্নত	অর্ধ-উন্নত	অনুন্নত
কৃষিখাত থেকে আয় (হেক্টর প্রতি মার্কিন ডলার)	২১৭৪	১৮৫৯	১৯১৩	৮৫৯	৯১৮	৯৪৯
কৃষিখাত থেকে আয় (শ্রমিক প্রতি মার্কিন ডলার)	৭৯১	৭৯১	৬৭২	৪৮৫	৪৯৪	৫২৮
অকৃষি খাত থেকে আয় (শ্রমিক প্রতি মার্কিন ডলার)	১২৭২	১১১০	৯৮৪	৬৭৫	৭৫১	৫৮৭
মোট আয় (শ্রমিক প্রতি মার্কিন ডলার)	১০২৬	৯০৩	৭৭৯	৫৫৪	৫৮৪	৫৪৮
খানার আয় (মার্কিন ডলার)	১৬২৮	১৪৭২	১১৮২	১০৪১	৯৪১	৮৮৩
মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলার)	৩২২	৩১১	২৬৪	১৬৩	১৭০	১৫৭

উৎস: Hossain & Bayes (2009)।

(ঙ) ভৌত অবকাঠামো এবং গ্রামীণ এলাকায় বিভিন্ন পেশার পরিবর্তন

গ্রামীণ এলাকায় শ্রমজীবীদের পেশাগত পরিবর্তনে ভৌত অবকাঠামোর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। পাকা রাস্তা এবং বিদ্যুতের অধিগম্যতার ফলে শ্রমজীবীরা বেশি সময় অবধি কাজ করতে পারে, অধিকতর উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ পায় এবং সর্বোপরি, গ্রামীণ এলাকায় যে বিভিন্ন পেশার বিশেষ করে অকৃষি খাতে কাজের সুযোগ রয়েছে সে ব্যাপারে সঠিক তথ্য সহজলভ্য হয়। অবশ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ যেখানে কৃষি খাতের উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের কর্মসংস্থান করা যায়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, কৃষি প্রধান পেশা হিসেবে তার গুরুত্ব হারিয়েছে, উন্নত এবং অনুন্নত উভয় গ্রামসমূহে। সাম্প্রতিককালে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে (সারণি ২০)। গ্রামীণ উন্নয়নের উপর বিভিন্ন সমীক্ষা এই রূপান্তরের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে গ্রামীণ এলাকায় ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন এই রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে। অনুন্নত বা অর্ধ-উন্নত গ্রামসমূহের তুলনায় স্বভাবতই উন্নত গ্রামসমূহ অকৃষি খাতের উপর অধিকতর নির্ভরশীল। উন্নত গ্রামসমূহে কৃষি কার্যে নিয়োজিত শ্রমিকের অনুপাত তুলনামূলকভাবে কম এবং এই অনুপাত সময়ের পরিক্রমায় ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে (সারণি ২০)। অর্থাৎ পাকা রাস্তা এবং বিদ্যুতের অধিগম্যতা বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষিকাজ, বিশেষ করে কৃষি মজুরি থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডে পেশাগত পরিবর্তন আরও দৃশ্যমান হয়েছে। এই তথ্যাদি এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ, বিশেষ করে ভারত এবং চীন থেকে সংগৃহীত তথ্যের সঙ্গে তুলনীয়। দ্বিতীয়ত, বহুবিধ পেশার ক্ষেত্রে অন্যান্য গ্রামের তুলনায় উন্নত গ্রামসমূহ পিছিয়ে আছে বলে লক্ষ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে অনুন্নত ভৌত অবকাঠামোর সাথে বহুবিধ পেশায় নিয়োজনের একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করা হয়। তাই স্বল্প আয় অর্জনকারী জনগণ সাধারণত বহুবিধ পেশায় নিয়োজিত হয়ে থাকে। এটা তাদের আর্থিক দৈন্যতারই বহি:প্রকাশ। অন্যদিকে ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন সেই সকল গ্রামের খানার সদস্যদের অর্জিত আয় বৃদ্ধির সহায়ক হিসেবে কাজ করে। সুতরাং উন্নত ভৌত অবকাঠামো গ্রামীণ এলাকায় খানার সদস্যদের আয় বৃদ্ধিতে কেবল সহায়তা করে তাই নয়, এই শ্রমজীবীদের অবকাশ বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও সহায়ক হিসেবে কাজ করে (Hossain & Bayes, 2009)।

সারণি ২০: পেশা চয়নের ক্ষেত্রে শ্রমজীবীদের শতাংশ হিসাবে ভৌত অবকাঠামোর প্রভাব, ২০০৮

নির্দেশক	প্রাথমিক/প্রধান পেশা			প্রাথমিক/প্রধান এবং মাধ্যমিক/গৌণ পেশা		
	উন্নত	অর্ধ-উন্নত	অনুন্নত	উন্নত	অর্ধ-উন্নত	অনুন্নত
কৃষিখাত	**৪৬.৪**	**৫৭.৭**	**৫৬.০**	**৬৬.০**	**৭৯.৩**	**৭৬.১**
কৃষি কাজ	৩৬.৩	৪৫.৬	৪৩.৩	৪৫.৯	৫৫.৮	৫০.৪
কৃষিতে নিয়োজিত শ্রমিক	৮.৯	১০.৮	১১.৪	১৭.৩	২১.১	২০.৬
অন্যান্য কৃষি	১.২	১.৩	১.৩	২.৮	২.৪	৫.১
অকৃষি খাত	**৫৩.৬**	**৪২.৩**	**৪৪.০**	**৬০.৬**	**৫০.৬**	**৪৯.৩**
ব্যবসা/বাণিজ্য	১৭.৪	১০.৬	১১.১	১৯.৮	১৪.৯	১২.৮
চাকুরি	২০.৮	১৬.৬	১৮.৭	২০.৭	১৭.৪	১৯.৬
অকৃষি কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত শ্রমিক	১৫.৪	১৫.১	১৪.২	২০.১	১৮.৩	১৬.৯
মোট	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১২৬.৬**	**১২৯.৯**	**১২৫.৪**

উৎস: Hossain & Bayes (2009)।

৬। উপসংহার

গ্রামীণ উন্নয়ন একটি বহুমাত্রিক বিষয়। এই প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে গ্রামীণ উন্নয়নের অনেক মাত্রাই বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি। এখানে আমরা বাংলাদেশে গ্রামীণ উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি যেমন কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের এবং তার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত গ্রামীণ এলাকায় ভৌত অবকাঠামোর ভূমিকা বিশদ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। গ্রামীণ উন্নয়নের অন্যান্য চালিকাশক্তি সমূহের বিশেষ করে ক্ষুদ্র ঋণের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনার তেমন কোনো প্রয়াস এই প্রবন্ধে নেওয়া হয়নি।

বিগত কয়েক দশকে গ্রামাঞ্চলে কৃষি খাতের গুরুত্ব হ্রাস পেয়ে অকৃষি খাতের গুরুত্ব বাড়ার প্রবণতা প্রধানত দুই ধরনের কারণে ঘটেছে (রহমান, ২০১২)। প্রথমটি ঘটেছে শ্রম সরবরাহের দিক থেকে কেননা এই সময়কালে জনসংখ্যা ও খানার সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কৃষি জমির উপর চাপ বেড়েছে। ভূমিহীন ও প্রান্তিক জমির মালিকের অংশ মোট খানার ৬০ ভাগেরও বেশি এবং এই অংশ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এই ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের একটি ক্ষুদ্র অংশ হয়তো জমি বর্গা বা পত্তনি নিয়ে কৃষিকাজ করতে পারে। অবশ্য যারা এত সম্পদহীন যে কৃষিকাজে বিনিয়োগ করতে একান্তই অপরাগ, তাদের পক্ষে কৃষি মজুরিতে নিয়োজিত হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু কৃষিকাজের ধরন এমন যে এখানে একজন শ্রমিক সারা বছর পর্যাপ্ত কাজ পায় না, কেননা কিছু মৌসুমে শ্রমের চাহিদা বেশি কিন্তু শুথ মৌসুমে চাহিদার স্বল্পতার ফলে কৃষি মজুরির কাজ থাকে না বললেই চলে। তখন অকৃষি খাতে কর্মসংস্থানের জন্য তারা স্বভাবতই আগ্রহী হয়। তবে শুধু অকৃষি কাজের জন্য আগ্রহের কারণে জনশক্তির সরবরাহ বাড়লেই চলবে না। গ্রামীণ এলাকায় বিভিন্ন শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে কর্মসুযোগও সৃষ্টি করতে হবে। এ ব্যাপারে সঠিক পরিমাণে বিনিয়োগ এবং অকৃষি উৎপাদনের চাহিদার বিষয়টিও বিবেচনায় আনা একান্ত প্রয়োজন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিভিন্ন কারণে কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এর অন্যতম কারণ কৃষিতে জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ এবং এই খাতে বিরাজমান উদ্বৃত্ত শ্রম অধিক

উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত করার ব্যাপারে শিল্প, সেবা এবং আধুনিক খাতসমূহের অপারগতা। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষিত হারে হয়নি অথবা উচ্চহারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলেও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যদিও গত কয়েক দশকে কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে বেড়েছে, এদের প্রসারের পথে বেশ কিছু অন্তরায় রয়েছে, বিশেষ করে বাংলাদেশে। ভৌত ও সামাজিক উভয় ধরনের অবকাঠামোই গ্রামীণ এলাকায় কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। একথা বলাই বাহুল্য যে, বিদ্যুতের সরবরাহ নিশ্চিত হলে এবং পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত হলে স্বভাবতই গ্রামাঞ্চলে শিল্প স্থাপনের ব্যাপারে উদ্যোক্তাগণ আগ্রহী হবেন। কোরিয়া এবং তাইওয়ানের উদাহরণ এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চীন এবং ফিলিপাইনের গ্রামীণ শিল্প সম্পর্কিত সমীক্ষায় দেখা গেছে, যেসব এলাকায় পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত এবং বিদ্যুতের সরবরাহ নির্ভরযোগ্য, সেসব অঞ্চলে গ্রামীণ শিল্পের তুলনামূলকভাবে অধিক প্রসার ঘটেছে (ইসলাম, ২০১০)।[২]

গ্রামীণ কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের প্রবৃদ্ধির পথে অন্যান্য অন্তরায়ের মধ্যে রয়েছে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের অভাব, পণ্য বাজারজাত করার সমস্যা এবং উপকরণের বাজার সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্যের অভাব। এখানে অর্থায়নের সমস্যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কেননা আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে এই ধরনের উদ্যোক্তাদের পক্ষে ঋণ সহজলভ্য নয়। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণের লভ্যতা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু যেসব বেসরকারি সংস্থা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে তাদের লক্ষ্য থাকে অতি ক্ষুদ্র উদ্যোগ যেখানে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া সহজ নয়। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তিগত উন্নয়ন প্রয়োজন এবং এর জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত মূলধন। কিন্তু ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী বেসরকারি সংস্থাসমূহ যে পরিমাণ ঋণ প্রদান করে এবং ঋণ পরিশোধের যে ব্যবস্থা থাকে, তাতে এই ধরনের ঋণ গ্রামীণ এলাকায় শিল্পের বিকাশে বিশেষ সহায়তা করতে পারবে বলে মনে হয় না (ইসলাম, ২০১০)। তাই গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে প্রয়োজনীয় ঋণের লভ্যতা নিশ্চিত করা এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহ যে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে তার পরিমাণ এবং ধরন যেন (কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড প্রসারের মাধ্যমে) গ্রামীণ শিল্পবান্ধব হয় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

[২] দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অল্প কয়েকটি দেশ বাদে অন্যান্য দেশে উদ্বৃত্ত শ্রমের একটি ক্ষুদ্র অংশই শিল্পে এবং অন্যান্য আধুনিক খাতে নিয়োজিত রয়েছে। তার ফলে জনশক্তির একটা বৃহৎ অংশ বর্তমানে কৃষি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত। এটি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাবে হয়েছে। কোনো কোনো দেশে সরকারের গৃহীত নীতিমালা সচেতনভাবে এই ধরনের কর্মকাণ্ডের বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে, যদিও বেশির ভাগ দেশেই এটা অবস্থার চাপে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়েছে (ইসলাম, ২০১০)।

গ্রন্থপঞ্জি

রহমান, রুশিদান ইসলাম (২০১২)। *বাংলাদেশের অর্থনীতি ও উন্নয়ন: স্বাধীনতার পর ৪০ বছর*। সাহিত্য-প্রকাশ, ঢাকা।

ইসলাম, রিজওয়ানুল (২০১০)। *উন্নয়নের অর্থনীতি*। দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

ADB. (2000). *Rural Asia: Beyond the green revolution*. Asian Development Bank.

Ahmed, M. U. (1984). Financing rural industries in Bangladesh. *The Bangladesh Development Studies*, *12*(1/2), 59-79.

Ahmed, R., & Hossain, M. (1990). *Development impact of rural infrastructure in Bangladesh* (Research Report No. 83). Washington, D.C.: IFPRI.

BBS (Bangladesh Bureau of Statistics). (2018). *Statistical yearbook of Bangladesh*. Statistics Division, Dhaka: Ministry of Planning.

Chuta, E., & Liedholm, C. (1979). *Rural non-farm employment: A review of the state of the art* (Rural Development Paper No. 4). Michigan State University, East Lansing.

Hossain, M. (2003). Rural non-farm economy in Bangladesh: A view from household surveys. Background technical paper prepared for the Dialogue on Promoting Rural Non-farm Economy: Is Bangladesh Doing Enough? Dhaka: Centre for Policy Dialogue, July 18.

Hossain, M., & Bayes, A. (2009). *Rural economy and livelihoods: Insights from Bangladesh*. Dhaka: AH Development Publishing House.

Hossain, M. I., Begum, M., Ara, E., Papadopoulou, E., & Semos, A. (2012). Rural development in Bangladesh since independence: A study on progress and performance. *Asian Journal of Agriculture and Rural Development*, *2*(3), 452-464.

Khan, M. M., & Zafarullah, H. M. (1981). The 1978 presidential election. A review. In S.R. Chakravarty and V. Narain (Eds.), *Bangladesh: Domestic politics*. p. l09. South Asia, New Delhi.

Mandal, M. A. S., & Asaduzzaman, M. (2002). Rural non-farm economy in Bangladesh: Characteristics and issues for development. In *BIDS-DFID Workshop paper* (pp. 22-23).

Otsuka, K., & Estudillo, J. (2007). *Changing sources of household income and poverty reduction in rural Asia, 1985–2004.* Paper prepared for Policy Forum on Agriculture and Rrural Development for Reducing Poverty and Hunger in Asia, IFPRI/ADB, Manila, 9-10 August.

Sen, B. (2003). Drivers of escape and Descent: Changing household fortunes in rural Bangladesh. *World Development, 31*(3), 513-534.

Shahabuddin, Q. (2000). Assessment of comparative advantage in Bangladesh agriculture. *The Bangladesh Development Studies*, *26*(1), 37-76.

Shand, R. (1986). Off-farm employment in the development of rural Asia. Canberra: Australian National University.

World Bank. (2005). *Promoting the rural non-farm sector in Bangladesh*. UPL.